দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 18 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাধিক্য

ডঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী

সম্প্রতি দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দরখাস্ত আহবান করেছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি দেশের বিদ্যোৎসাহী মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছে। এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

।।ক।।

সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিভেদে শিক্ষকগণের যোগ্যতা নির্ধারিত হওয়াই যথার্থ। শিক্ষার্থীদের স্তর এবং শিক্ষকের জ্ঞান-গরিমা প্রভৃতির মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদপ্রার্থীদের জন্য ঘোষিত শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপক পার্থক্যের বিষয়টি এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধানশিক্ষক পদের জন্য মূলতঃ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চেয়েছেন। অথবা বিদ্যালয়ে তিন বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকলে স্নাতক ডিগ্রী থাকলেও চলবে। আবার লক্ষণীয় যে, সহকারী শিক্ষক পদের জন্য এম, এস, সি, পাস প্রার্থীদেরও নেয়া হবে।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এস, এস, সি বা এইচ, এস, সি পাস ব্যক্তিগণ নিয়োগ / শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন সেই প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের নিয়োগের যথার্থতা কতটুকু? জানামতে দেশে এখনও হাজার হাজার এস, এস,সি, এইচ, এস, সি, ও ম্যাট্রিকুলেশন পাস শিক্ষক রয়েছেন, যারা অত্যন্ত সুচারুরূপে শিক্ষাদান ও আনুষঙ্গিক দায়িত্বসমূহ পালন করে চলেছেন। আলোচ্য নতুন নিয়োগনীতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কেননা, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও একই রকম দায়িত্ব কর্তব্য সম্বলিত পদে ব্যাপক বৈষম্যমূলক শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ স্থানীয়ভাবে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে নানা বিপত্তির সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়। নতুন ব্যবস্থা শিক্ষকগণের মধ্যে এক ধরনের ভেদজ্ঞান তৈরি করবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারধাপ বিশিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগ ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান তৈরিতে সাহায্য করবে। এ পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটাবে। তাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের সিদ্ধান্ত বিদ্যমান অবস্থায় যথোচিত নয় বলেই মনে হয়।

এ ক্ষেত্রে আরো মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে প্রধান শিক্ষকের পদটি মূলতঃ কোন প্রশাসনিক পদ নয়। আজও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পদ নির্বিশেষে অভিন্ন মর্যাদাবোধ নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে কেউ 'বস' আর কেউ 'সাব-অর্ডিনেট' নন। কিন্তু এবারের নতুন নিয়োগনীতির অন্তর্নিহিত রূপটি এক ধরনের "উচ্চ-নীচ" ক্রমের (Hierarchy) প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে-এর ফলে শিক্ষাদানের সুবিধার চেয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়। স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের আরো কিছু অসুবিধাজনক দিক রয়েছে। একজন ছাত্র শিক্ষার্থী যে স্বপ্নসাধ, আশা-আকাংখা নিয়ে (এবং প্রতিমাসে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে এবং বিশেষায়িত জ্ঞান নিয়ে বের হয়, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার চাকরির সঙ্গে তা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় ফলে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া এ চাকরি পেলেও বাস্তবে বেতনের স্বল্পতা, বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্ব ও জীবনের সম্ভাবনাহীনতার কারণে তাদের অধিকাংশেরই স্বপ্নভঙ্গ ঘটবে। ফলে, ক্রমশঃ নানা বিতৃষ্ণা, হতাশা ও কর্মবিমুখতার আবর্তে তারা নিক্ষিপ্ত হবে। এর পরিণাম শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে কিরূপ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এর পারেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে দায়িত্ব চমৎকারভাবে এস, এস,সি, বা এইচ, এস, সি পাস ব্যক্তিদের দিয়ে সম্পন্ন করা যায় সেক্ষেত্রে বড়জোর স্নাতক ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের নিয়োগ উচ্চতর যোগ্যতা ও মেধার নিদারুণ অপচয় বড় ধরনের জাতীয় ক্ষতি বৈ কিছু নয়। মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে একজন মোটামুটি বিশেষজ্ঞ হিসেবেই তৈরি করা হয় আর এ জন্য জাতীয় আয়ের একটি বড় অংক ব্যয়িত হয়। সুতরাং জাতীয় স্বার্থেই প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে তাদের নিয়োগের ধারণা অনুমোদন করা যায় না। যদি তর্কের খাতিরে বলা হয় যে, এই দুর্দিনে উচ্চশিক্ষিত বেকারদের এই পন্থায় জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন কিংবা যদি বলা হয় যে উচ্চতর ডিগ্রীধারীগণ আরো ভালভাবে শিক্ষাদান করবেন তাহলে বলব বিপুল জাতীয় রাজস্ব ব্যয় করে এরূপ কাজের জন্য তাদের তৈরি করা হয়নি, তেমনই উচ্চতর ডিগ্রী থাকলেই শিশুদের ভালো শিক্ষাদান করা সম্ভব তা জোর করে বলা যায়না। এমনকি কখনো শিক্ষকের অতিরিক্ত যোগ্যতা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে। তদুপরি উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের জন্য চাকরির আরো বহুবিধ ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে যেখানে নিম্নতম ডিগ্রীধারীদের প্রবেশাধিকার নাই। এক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রীধারীগণ যদি এইরূপ নিম্নতম পদে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন তবে সেক্ষেত্রে নিম্নতম ডিগ্রীধারীদের অনেকের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে উচ্চতর/মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের জন্য সরকারকে অবশ্যই ভাবতে হবে। তাদের মেধা, যোগ্যতা ও মানসিকতার সংগে মানানসই কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

।।খ।।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ষাটভাগ পদে মহিলাদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত সুবিবেচনা প্রসূত বলে মনে হয় না। আমাদের সামগ্রীক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই এই ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। যদি পাশ্চাত্যের দেশসমূহের দৃষ্টান্ত অনুসারে আমাদের দেশও মেয়েদের এমন ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয় এবং তা হবে স্রেফ একদেশদর্শিতা। মনে রাখা দরকার পশ্চিমী দুনিয়ার তরুণ-তরুণীগণ ১৮/২০ বছর বয়স হতে প্রায় সকলেই শিক্ষা খরচ, বেকার ভাতা ও নানান রকম রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করে থাকে। আমরা আমাদের বেকার যুবকদের জন্য তদ্রুপ করতে পারিনি; এছাড়া পাশ্চাত্যের সামাজিক মূল্যবোধের কথা না হয় বাদই দিলাম। তাই দেশে হাজার হাজার তরুণ/যুবককে কর্মহীন রেখে মেয়েদের এই বিশেষ সুবিধাদান সমাজে নৈরাজ্য ও অনাচার সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগবে বৈকি।

বাস্তবে দেখা যাবে, তরুণী বোনটি চাকরি পেয়ে আর একজন চাকরিজীবীকে বিয়ে করে (অথবা তিনি ইতিমধ্যে তেমন কারো স্ত্রী) বাড়তি আয়ে দিন গুজরান করছেন, আর যুবক ভাইটি বেকার থেকে হতাশার অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। অথচ কথাছিল এই যুবকটি পরিবারের দায়িত্ব নেবে, ছোট ভাইবোন এবং পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন করবে কিংবা প্রত্যাশা ছিল নিজেই একটি সংসারের সূচনা করবে। কিন্তু বেকারত্বের অবমাননা কাঁধে নিয়ে সে ঘুরে মরছে। এই পরিস্থিতি একদিকে সমাজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে ও স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক হেরফের সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে সমাজে আরো নৈরাজ্য ও সংঘাতপূর্ণ পরিবেশের সূচনা করবে। সর্বোপরি পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি হবে বিপন্ন।

একথা আমরা জানি পাশ্চাত্যের অর্থদাতা দেশ/সংস্থাসমূহ নানা শর্ত আরোপ করে অর্থ দিয়ে থাকে। তন্মধ্যে নারীদের অধিক হারে কর্মসংস্থান অন্যতম। এর সরল হচ্ছে দরিদ্র দেশসমূহের বিশেষেতঃ ইসলামী ভাবাপন্ন জাতিসমূহের চিরায়ত শান্তির আধার স্বরুপ পরিবারকে ভেঙ্গে দেয়া। ওরা চায়না যে আমাদের পরিবার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু যে মহিলাগণ তারা আদব আব্রু নিয়ে মর্যাদাপূর্ণভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করুক ও পরিবার ব্যবস্থা টিকে থাকুক। তাই ওরা আমাদের লক্ষ লক্ষ যুবককে কর্মহীন রেখে মেয়েদের তথাকথিত সমানাধিকার, মুক্তি ও প্রগতির অজুহাতে ঘরের বাইরে টেনে আনার কূট যুক্তির অবতারণা করে।

আমরা আমাদের নারী সমাজের প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। কিন্তু তা অবশ্যই পশ্চিমী দেয়া প্রেসক্রিপশন মোতাবেক নয়, বরং আমাদের সামাজিক বাস্তবতা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সংগতি রেখেই তা দিতে চাই।

আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রীতিপূর্ণ পরিবার ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার তাগিদে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধিকসংখ্যক যুবকদের নিয়োগের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। এই সাথে আমাদের দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে মহিলারা কতটুকু সুষ্ঠুভাবে গ্রাম-গ্রামান্তরে নিত্যদিনের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম তাও ভেবে দেখতে হবে। সুতরাং মহিলাদের জন্য যে প্রচলিত কোটা বরাদ্দ রয়েছে তা অক্ষুণ্ণ থাকলেই বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট বলে মনে করতে হবে এমতাবস্থায় শতকরা ষাটভাগ পদ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের [illegible] প্রত্যাহার করা একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে [illegible] হিসেবে [illegible] হবে

।।গ।।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষা। শিশুর মেধার বিকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই শিক্ষায়তনের প্রভাব অপরিসীম। তাই কচিকাঁচা বিদ্যার্থীদের মেধার লালন চিন্তা-চেতনার ভিত রচনা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শতকরা নব্বই জনেরও অধিকসংখ্যক ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অভিযোগ উঠেছে যে, নানা কারণে ইতোমধ্যে এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে সংখ্যালঘু কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অধিকমাত্রায় নিয়োগলাভ করেছেন। স্পষ্টতঃই এই বিদ্যার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শিক্ষার্থীদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষকগণ যথাযথ শিক্ষাদান ও যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে অপারগ। ফলে নবীন প্রজন্ম যথোচিত আদব, আখলাক, ঐতিহ্য, চেতনা ও প্রকৃত জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে খন্ডিত অথবা ভ্রান্ত কতক ধারণা লাভ করে বিবর্ধিত হবে। বঞ্চিত হবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ষোলআনা সুফল থেকে। আর এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

তাই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতির অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় বিবেচনায় রেখে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাই সংখ্যালঘুদের উপর অবিচার না করেই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থী এবং বিদ্যার্থীর স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে হবে। যদি কোন মহল এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়াস পায় তাতে কর্ণপাত করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা সাম্প্রদায়িকতার ভুয়া দর্শন বিবেচনায় এনে আমাদের ঐতিহ্য ও সামাজিক অর্থনৈতিক স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিতে পারি না। মনে রাখতে হবে যে, এ সবের সংগে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। পরিশেষে জাতি হিসেবে আমাদের অপরিসীম দুঃখ, ক্লেশ ও পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। এখানে দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে জ্ঞানের আলো পদান করা আশু কর্তব্য। কিন্তু এই কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা যেন এমন কোন অনুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি যাতে জাতি নিরক্ষতার অভিশাপ কিঞ্চিৎমুক্ত হলেও কাঙ্খিত আদলে কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণ প্রচেষ্টা পন্ড হয়ে যায়। তাই সময় বয়ে যাবার আগেই এ বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।